যশ যেমন পেলেন, অপযশও হল

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ টেগোর/ ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব গ্লোবাল রিসেপশন, সম্পাদনা: মার্টিন কেম্পশেন ও ইমরে বাংঘা। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ১১৯৫.০০

তখন ২০১১ সালের মে মাস, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি ও বিশ্বখ্যাতি লাভের শতবর্ষ পূর্ণ হবে, অল্পদিন বাকি। লন্ডনের টেগোর সেন্টারে রবীন্দ্র-সম্মেলন, সেই উপলক্ষে সেখানে গিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের দুই সম্পাদক মার্টিন কেম্পশেন ও ইমরে বাংঘা আর ছিলেন এই বইয়ের সম্পাদনা-উপদেষ্টা উমা দাশগুপ্ত। ওইখানেই স্থির হল, বিশ্বখ্যাতি লাভের একশো বছর উপলক্ষে একটি সংকলনগ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করবেন। পরিকল্পনা মতো ৩৫টি প্রবন্ধের একটি ৬৭১ পৃষ্ঠার সুগ্রথিত গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। সারা পৃথিবীর একশো বছর ব্যাপী রবীন্দ্র চর্চার ইতিহাস ধরে রাখল এই বই। শুধু অনালোচিত রইল ভারত উপমহাদেশের এই সময়ের রবীন্দ্র চর্চার ইতিবৃত্ত।

প্রবন্ধ-পরিকল্পনায় বিশ্বকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া; ২। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা; ৩। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ; ৪। উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ; ৫। আমেরিকা দ্বয়। বিষয়-প্রস্ফুটনের দাবিতে প্রায় সব প্রবন্ধেই সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের প্রয়োজনীয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে আঙ্গিকগত কিছু মিল আছে, কিছু অমিলও, তাদের বিষয়গত বৈচিত্রও উপভোগ্য। রবীন্দ্র-গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ সব প্রবন্ধেরই একটি প্রধান দিক। অধিকাংশ প্রবন্ধ শুরু হয়েছে সে দেশে ভারত চর্চার ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আলোচনায়। কোনও দেশের বা প্রথম ভারতযোগ এশিয়ার কবির নোবেলজয়ের সূত্র ধরেই, কারও বা রবীন্দ্র শতবর্ষে।

বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে একটা প্রশ্ন এ দেশে প্রায়ই শোনা যেত, রবীন্দ্রনাথ কি আজকের দিনে আর প্রাসঙ্গিক। এই বই হাতে নিয়ে সেই পুরনো প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিসম্পদ রেখে যান, কাল থেকে কালান্তরে রসিক মন জিজ্ঞাসু মন কবি-শিল্পী-মনস্বীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আপন আপন চাহিদা মতো উপকরণ আহরণ করে নেয়। কবিও তো সেই কথাই বলেন:

'যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক,/ যতদিন থাকে ততদিন থাক্/ যশ-অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক/ ধূলার মাঝে।/ বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ/ আমার সে নয় সবার সে আজ,/ ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ/ বিবিধ সাজে।'

নোবেল প্রাইজের গৌরব-ভূষিত কবি দেশে দেশে তাঁর দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। কত দেশ কত ভাবেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বিচার করল। যশ যেমন পেলেন, অপযশও হল। তাঁকে অস্বীকার করবার দিন এল কখনও কোথাও। রবীন্দ্র চর্চার ইতিহাসে সেও এক বড় দিক। ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনাধীন দেশগুলিতে দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ ছিল রবীন্দ্রচর্চা, বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও তাই। স্পেনীয় কোনও কবির বা গীতাঞ্জলির কবিতা স্বপ্নালু মনে হল (প্রবন্ধ ২৭), পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের যে আহ্বান ছিল রবীন্দ্রনাথের, জাপানের কোনও বিদ্বজ্জন তা খারিজ করলেন (প্রবন্ধ ১)। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই জানতাম। বিপরীত চিত্রটায় আলো পড়েছে এখানে (প্রবন্ধ ১৩)। বিশ্বব্যাপ্ত উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদে তিনি কলম ধরেছিলেন। জাপান সমালোচনায় মুখর হল (প্রবন্ধ ১), ইংল্যান্ড-আমেরিকা সর্বত্রই তিনি বিরাগভাজন হলেন (প্রবন্ধ ২৯)।

এই ছবিটাই সব নয়। মানুষের মনে এই কবি-মনীষীর প্রভাববৈচিত্রের দিকে নজর টেনে গ্রন্থভূমিকায় সম্পাদকরা বলেন, এটা অভিনব যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও উপলব্ধি কোনও একটি বিশেষ আদর্শানুগত বৃত্তেই শুধু প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি, তাঁর উপলব্ধ সত্যের, তাঁর অনুভবের সক্রিয় সজীবতা বহুবিচিত্রগামী। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়তে পড়তে বিস্মিত হই, রবীন্দ্রমানস যেন আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে, মানুষের অন্তর অন্তরে। অনেক দেশকে রবীন্দ্রনাথের কোনও-না-কোনও আইডিয়া তাঁর কাব্যের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। ব্রাজিল ও লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলি তাঁর শিক্ষাদর্শনের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছিল। ব্রাজিলের একটি বিদ্যালয়পাঠ্য সংকলনের কথা বলি। ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সংস্করণ-সংখ্যা একশো। সংকলনে 'দি ক্রেসেন্ট মুন' থেকে 'স্লিপ স্টীলার' ('ঘুমচোরা'। শিশু) কবিতাটা স্থান পায়। সে দেশের সব ছেলেমেয়ের একান্ত প্রিয় এই কবিতা স্বয়ং কবিকেও তাদের আপন করেছিল (প্রবন্ধ ৩১)।

পাশ্চাত্যমুখিনতার প্রভাবে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান (প্রবন্ধ ১) এককালে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেছিল, সে অস্বীকৃতি স্থায়ী হয়নি। আবার পশ্চিমের যে দেশ কবি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছিল, মধ্যবর্তী দীর্ঘ পর্বে সেই ইংল্যান্ড তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় (প্রবন্ধ ২৯), এ কালের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সে দেশে তাঁর বহুকৌণিক সফল স্বীকৃতি।

মার্টিন কেম্পশেন প্রবন্ধ শেষে (প্রবন্ধ ২৩) ভবিষ্যৎ জার্মানির জন্য কোন কোন রবীন্দ্র-ভাবের চর্চা মঙ্গলপ্রদ হবে, তার দিক্‌নির্দেশ করেছেন। এ কালে ফ্রান্সে সজীব রবীন্দ্র চর্চার বাধা আছে, বলেন ফ্রাঁস ভট্টাচার্য (প্রবন্ধ ২৬)। 'যোগাযোগ' উপন্যাস অবশ্য মূল বাংলা থেকে তিনিই অনুবাদ করেছেন, এবং 'শেষ লেখা'-র কবিতা। তবে বর্তমান অবস্থা যা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নতুন ফরাসি অনুবাদ যদি হয়ও, প্রকাশক অমিল হবে। কিন্তু ফ্রান্সে আজও রবীন্দ্র-কবিতায় সুরারোপ করে সফল প্রয়োগ হয়ে থাকে। ২০১২ সালেও প্যারিসে রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। ললিতকলা চর্চায় আজও রবীন্দ্রপ্রভাব যে গভীর, তারও প্রমাণ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। রাশিয়ার গানে (প্রবন্ধ ১৩) শ্রীলংকার নাচ-গান-চিত্রশিল্পে (প্রবন্ধ ৭) এই প্রভাব। এমনকী ২০০৯ সালের একটি রক ব্যান্ড লোকসংগীত অ্যালবামে চেক কবিদের লিরিকের সঙ্গে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ফায়ার ফ্লাইজ-এর কবিতাও সুরারোপিত (প্রবন্ধ ২০)।

অনেক দেশকে রবীন্দ্রনাথের কোনও-না-কোনও আইডিয়া তাঁর কাব্যের চেয়ে বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে।

বুলগেরিয়ায় রবীন্দ্রনাথ, নভেম্বর ১৯২৬।

কানাডায় রবীন্দ্র চর্চা এখনও রীতিমত বর্ণাঢ্য। আমেরিকার রবীন্দ্র চর্চার চিত্র আবার বরাবরই অনুজ্জ্বল, তার উপরে (প্রবন্ধ ৩০) কয়েকটি সুপরিচিত তথ্যের পরিবেশনে ভুল চোখে পড়ল, এটা অপ্রত্যাশিত ছিল। যেমন, প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে আর্বানায় গেলেন ছেলেকে দেখতে, উইলিয়ম পিয়র্সন ছিলেন আমেরিকান!

১৯২৬ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ মিশরে যান। সে সময়ের আরব-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি আহ্‌মদ সাকি বেক কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেন, এ কথা ভেবে তাঁর ভাল লাগে যে, বিশাল জনসংখ্যা ভারতের, বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী পেয়েছেন তিনি (প্রবন্ধ ৯)। উত্তরে স্মিতমুখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর দেশ বড়, কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে ভাষা ভিন্ন, তাঁর কবিতার পাঠক তাই সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কবি বেক বরং ভাগ্যবান, তাঁর পাঠকরা সমস্ত আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছেন।

আজও সারা ভারতে পৌঁছয়নি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য। বিদেশের তাঁকে প্রথম জানা ইংরেজি ভাষায়, সেই মাধ্যম অবলম্বনেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশের পরিচয় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ। ক্রমশ অনুবাদের অনুবাদ হতে লাগল। কোনও দেশের পাঠকের হাতে রবীন্দ্র-রচনা পৌঁছেছিল তিন-চার ভাষায় রূপান্তরের স্তর পার হয়ে। আবার কোনও কোনও ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ থেকে একাধিক অনুবাদ হয়েছে একই গ্রন্থের। বলা বাহুল্য, প্রধানত গীতাঞ্জলির।

শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (প্রবন্ধ ২৭) ইংরেজি ও স্প্যানিশ অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন কবি-অনুবাদক হুয়ান রামোন হিমেনেথ অনেক স্থলে শব্দ ও ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, আঁদ্রে জিদ তাঁর ফরাসি অনুবাদে এতটা স্বাধীনতা নেননি। এই ধরনের দৃষ্টান্ত সহ তুলনামূলক আলোচনা অন্য প্রবন্ধেও আছে (প্রবন্ধ ৩: চায়না)। এমন সব হাত-ফেরতা অনুবাদে মূল রচনার কাব্যগুণ বেশ কিছুটা হারায়। তবু রবীন্দ্রনাথকে আপন ভাষায় পাওয়ার ইচ্ছার ইঙ্গিতটুকু রেখে যায় এ সব অনুবাদের খবর। তবে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের ইতিহাসও বেশ পুরনো। প্রথম স্থান চেকোস্লোভাকিয়ার (প্রবন্ধ ২০), প্রথম অনুবাদক লেসনি (১৯১৪)। সিলভ্যাঁ লেভি, মরিস উইন্টারনিট্‌স্, ভিনসেন লেসনি-র মতো প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সহৃদয় সংযোগ। লেসনি-র রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের উত্তরাধিকার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বহন করেছেন প্রাচ্যবিদ চেক পণ্ডিত দুসান জাভিতেল। চেক অনুবাদে তাঁর কবির শেষ পর্যায়ের প্রেমের কবিতা সংকলন ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই চেষ্টার শুরু, প্রথম বাংলা থেকে অনূদিত হয় 'জীবনস্মৃতি' (প্রবন্ধ ১৩)। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে জাপানে (প্রবন্ধ ১) মূল গীতাঞ্জলি-র সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়। অনুবাদক ওয়াতানাবে শোকো বাংলা গীতাঞ্জলি-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির অনুবাদও গ্রন্থে স্থান দেন। এ কালের তিন বিশিষ্ট জাপান-দেশীয় অনুবাদকের মধ্যে কাজুও আজুমা আমাদের সবচেয়ে পরিচিত। বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় 'গোরা' অনুবাদ করেন সানো জিন্নোসুকে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মার্টিন কেম্পশেন (জার্মান ভাষায়), উইলিয়ম রাদিচে, কেতকী কুশারী ডাইসন (ইংরেজি ভাষায়) প্রমুখ যাঁরা বাংলা থেকে রবীন্দ্ররচনার ভাষান্তরে আত্মনিয়োজিত, রবীন্দ্র চর্চার শতবর্ষের ইতিহাসে তাঁদের অমূল্য আসন, নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তাঁরা (প্রবন্ধ ২৪)।

শেষ কবার আগে আর এক খবরের মতো খবর। এই গ্রন্থে ভারত তো নেই, কিন্তু এক কোণে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে ভারতের গোয়া (প্রবন্ধ ১২)। ১৯১৪ সালে 'চিত্রা'-র (চিত্রাঙ্গদা) পর্তুগিজ অনুবাদ প্রথম গোয়া থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। পর্তুগিজ ভাষায় অনূদিত এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই।

সম্পাদকমণ্ডলীর এই বিশ্বছোঁওয়া দূরদর্শী প্রয়াসকে অভিনন্দন। সুনির্বাচিত সহমর্মী প্রাবন্ধিকদের সহযোগ রবীন্দ্র চর্চার একশো বছরের ইতিহাসকে বর্ণময় করে তুলেছে। পড়তে পড়তে মনে হল, সমাদরে-অনাদরে পৃথিবী যেন বার-বার কবিকে বলেছে এই শতবর্ষকাল ধরে— 'যেতে আমি দিব না তোমায়'।